রংদার রোববার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২২ নভেম্বর ২০২০ নয়

উত্তমের আবেগাস্ত্র সৌমিত্রর মগজাস্ত্র

তুলিকলা সাধন দে

মানুষটার সঙ্গে তো আজকের পরিচয় নয়, সেই কবে থেকেই আলাপ প্রলাপ বিলাপ। নানান অভিজ্ঞতায় ভরে আছে জীবন। তাঁর প্রয়াণে আরও বেশি করে মনে পড়ছে সেসব। বারবার ফ্ল্যাশব্যাকে চলে যাচ্ছি আমি।

জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে থাকলেও অহংকার তাঁকে ছুঁয়ে যায়নি কখনও। খুব সাধারণভাবেই সকলের সঙ্গে মিশতেন। কথা বলতেন। একটা ঘটনা বলি। সৌমিত্রবাবুর সঙ্গে আউটডোরে গেছি। সঙ্গে ছিলেন নির্মল ঘোষ। ওঁর খুব ভালো বন্ধু। একটা বাড়িতে শুটিং চলছে। তা শুটিংয়ের অবসরে দেখি, সৌমিত্রবাবু বসে বসে কী সব লিখছেন। ওঁর একটা 'খেরোর খাতা' ছিল। সেই খাতায়। নির্মলবাবু এসে বললেন, 'পুলু, তোর খিদে পায়নি?' উনি হাসলেন। 'তা তো পেয়েছে।' নির্মলবাবু বললেন, 'কিন্তু কখন কী যে খেতে দেবে।' সৌমিত্রবাবু খুব নির্লিপ্তভাবে জানলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আরে! চিন্তার কী! ওই তো সামনে পেয়ারাগাছ। পেয়ারা নিয়ে আয়।'

কাজের ব্যাপারে সৌমিত্র ছিলেন নিখুঁত। একবার একটি নাটকে আবৃত্তি রেকর্ডিং করিয়েছিলেন আমাকে দিয়ে। পরে নাটক করতে গিয়ে দেখলাম, আমার সেই কণ্ঠস্বরটাই নেই। ওঁর কণ্ঠস্বরে আবৃত্তিটা চলছে। আর উনি সেটা আমাকে জানাননি পর্যন্ত! সম্ভবত পছন্দ হয়নি। নাটকের প্রয়োজনে উনি সেটা এডিট করেছেন। সে যাইহোক, কোথায় তীক্ষ্ণ থাকতে হবে আর কোথায় উদাসীন, কোথায় বা পরিস্থিতি-পরিবেশের গুমোট ভাব কাটাতে কী বলে উঠতে হবে, ওঁর মতো ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে খুব কম মানুষকে দেখেছি।

মনন, শিক্ষা এবং সবদিকে নজর, সবমিলিয়ে সৌমিত্রবাবুর মধ্যে 'মগজাস্ত্র'টাই যেন প্রখর। আমার মতে, উত্তমবাবুর যদি থাকে আবেগ

মাধবী মুখোপাধ্যায়

অর্থাৎ 'আবেগাস্ত্র', তা হলে সৌমিত্রবাবুর ছিল অবশ্যই 'মগজাস্ত্র'। সে কারণে 'চারুলতা'র অমল, 'অপুর সংসার'-এর অপু সবাইকে ছাপিয়ে গেছে সৌমিত্রবাবুর 'ফেলুদা' চরিত্রটি। ওঁর বুদ্ধির সঙ্গে যেন মাপে মাপ। 'অপু' বা 'অমল' চরিত্র দুটো যদি বা অন্য কাউকে ভাবলেও ভাবতে পারি, কিন্তু 'ফেলুদা' চরিত্রে সৌমিত্রবাবু ছাড়া অন্য কাউকে ভাবতেই পারি না। চলনে-বলনে এতটাই বুদ্ধির ছাপ।

আর একটা ঘটনার কথা বলি। বেশ রাত তখন। লেক গার্ডেন্স রেল ক্রসিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের গাড়ি। বাড়ির প্রায় দোরগোড়ায় চলে এসেছি। সৌমিত্রবাবু হঠাৎই উচ্চস্বরে আবৃত্তি আরম্ভ করলেন। আমরা অবাক। আসলে, রেল ক্রসিংয়ে আটকে আছি তখন আমরা, তায় মালগাড়ি আসছে। অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হবে। নাটকের ডবল শো সেরে সবাই তখন ক্লান্ত। এলিয়ে পড়েছি। আর আমাদের বিরক্তি বুঝতে পেরেই, সৌমিত্রবাবু কবিতায় ভাসিয়ে দিলেন সকলকে। আমাদের বিরক্তি নিমেষে উধাও। হবে না, অত সুন্দর কণ্ঠস্বর।

এর থেকেই বোঝা যায়, কতটা ধৈর্যশীল ছিলেন উনি। নিজের বিরক্তি তো ঢাকলেনই, সঙ্গে আমাদেরও বিরক্ত হতে দিলেন না! সত্যি পরিস্থিতি-পরিবেশকে নিমেষে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসতে সৌমিত্রবাবুর জুড়ি ছিল না। যদি বলি, এই যে এতদিন ধরে উনি মাথা উঁচু করে কাজ চালিয়ে নিয়ে গেছেন, তার রহস্য কী? তা হলে বলব, তা ওঁর ওই স্বভাবের গুণে। না হলে মালগাড়ি আসছে দেখে কেউ কাজের শেষে মন খুলে আবৃত্তি করতে পারে!

মজা করতেও ওঁর জুড়ি ছিল না। সেবার শুটিংয়ে চলেছি আমরা। উনি গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন। তারপর জিলিপি কিনতে পাঠালেন। এমনিতে ওঁর কোনও খাবারে সেভাবে তেমন উৎসাহ ছিল না। কিন্তু কোথাও জিলিপি ভাজতে দেখলেই হল। আমাকে বললেন, 'জিলিপি খাবেন তো?' আমি বললাম, 'না'। উনি বললেন, 'কেন'? আমি বললাম, রসে যে হাত চটচট করবে। শুনে বললেন, 'তাতে কী আছে? একটু হাত ঝুলিয়ে রাখবেন, রসটা শুকিয়ে যাবে। তারপর রস শুকিয়ে, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। তারপর আঙুলটা চুষে নেবেন। হয়ে গেল।' এভাবেই সৌমিত্রবাবু রস-সমস্যার সমাধান করেছিলেন সেদিন।

আর একটা ঘটনা মনে পড়ছে, খুব মজার। 'স্টার' থিয়েটারে 'ঘটক বিদায়' নাটকে করছি। সেদিন রবি ঘোষের পেটটা গণ্ডগোল করছে। মুডটা ভালো নেই। তাই নিয়েই মঞ্চে। ওদিকে অনুপকুমার উইংসের থেকে রসিকতা করে সমানে বলছেন, 'রবি, খবরদার জোরে ডায়ালগ নয়... জোরে ডায়ালগ নয়।' শুনলে কার না হাসি পায়? কিন্তু সৌমিত্রবাবু উত্তেজিত! সিরিয়াস। অনুপকুমারকে পিছন থেকে টানছেন আর বলছেন, 'অনুপ, দয়া করে আমার সর্বনাশটা করিস না।' তো এই হলেন সৌমিত্রবাবু। শেষ জীবন পর্যন্ত একই ছিলেন।

আসলে যে কোনও বড় মাপের মানুষেরই মাথা যেমন আকাশ ছোঁয়, তেমনই পা থাকে মাটিতে। একদিকে যেমন রসিকতা করছেন, অন্যদিকে নাটক বা ছবির চরিত্রের মধ্যে বাস করছেন সর্বক্ষণ। 'খেরোর খাতায়' কবিতা লিখছেন, আবার গাছ থেকে পেড়ে পেয়ারাও খাচ্ছেন। সৌমিত্রবাবু হলেন একই সঙ্গে মাটির ও আকাশের। তাই তাঁকে মাপা বা বিশ্লেষণ করা সহজ কথা নয়। মানুষটা দিনের পর দিন লাইব্রেরিতে মুখ গুঁজে বই পড়তেন, একটা রাজনৈতিক বোধও ছিল। ইন্টেলেকচুয়াল। স্বভাব-কবি। আবার তারকাও। অনুলিখিত

রেল ক্রসিংয়ে আটকে আছি, মালগাড়ি আসছে। অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হবে। নাটকের ডবল শো সেরে সবাই ক্লান্ত। সৌমিত্রবাবু কবিতায় ভাসিয়ে দিলেন সকলকে। কি কণ্ঠস্বর!

সদ্য প্রয়াত অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত স্মরণে

অলোকের সঙ্গে এক সন্ধ্যা

শঙ্খ ঘোষ

গোটা ষাটের দশক জুড়ে অলোকের সঙ্গে নিত্য সময় কাটানোই ছিল আমার পক্ষে মস্ত একটা উপার্জন। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার আর বিরাম ছিল না আমাদের। কত যে কিছু শিখেছি তখন ওর কাছে। আবার, মুখোমুখি হয়েছি কত উদ্ভট ঘটনার। এক সন্ধ্যার কথা বলি।

বরযাত্রীর দৌড়

আমাদের এক অনুজকল্পের বিয়ের খবর জানিয়ে অলোক বলে একদিন, 'আপনাকে আর আমাকে কিন্তু বরযাত্রীও যেতে হবে।'

'বরযাত্রী? বরযাত্রী কেন? আরে না না, একেবারে বউভাতের দিন যাব।'

'চলবে না তাতে, দুদিনই যেতে হবে। বিশেষ করে বলে দিয়েছে।'

'তুমি যেও দুদিন। আমি একদিনই যাব।'

'তাহলে কিন্তু ও ভাববে যে নিজের মুখে জানাতে পারল না বলে আপনি গেলেন না। সেটা কি ভালো হবে?'

'এ তো মুশকিল হল।'

'মুশকিলের কী? আমাদের বাড়িতে আসবেন। এখান থেকে একসঙ্গে চলে যাব।'

কাজেই এক সন্ধ্যায় বরযাত্রী হবার সদুদ্দেশ্যে অলোকের সেন্ট্রাল পার্কের আস্তানা থেকে রওনা হই দুজন। বেরোবার মুখে মাসিমা একবার জিজ্ঞেস করেন, 'একটু কিছু মুখে দিয়ে যাবে না কি তোমরা?' অলোক বলে। 'বাঃ, যাচ্ছি বিয়েবাড়ি, এখন আবার ওসব কেন?' কথাটা সংগত বিবেচনায় মাসিমাও আর জোর করেন না।

দলের সঙ্গে যাচ্ছি না আমরা, আমরা যাচ্ছি আলাদা। বাস থেকে একটা স্টপে নেমে নির্দেশিত লম্বা ঝিলের পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকি বিয়েবাড়ির লক্ষ্যে। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করি, 'ঠিকানাটা তো তোমার সঙ্গেই আছে নিশ্চয়?'

'ঠিকানা আর কী! ঝিলের ধারে বিয়েবাড়ি।'

'এই মাত্র? সে তো অনেক বাড়ি থাকতে পারে।'

'না না, অনেক বাড়ি হবে না।'

কিন্তু বলতে বলতেই মস্ত প্রাঙ্গনওয়ালা এক প্রাসাদবাড়িকে পাশ কাটিয়ে যেত হল। সেটা বিয়েবাড়ি বটে, কিন্তু অতবড় বাড়িটা আমাদের অভীষ্ট হতে পারে না। এর ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে বন্দুকধারী দুই সান্ত্রি, আলোয় বাজনায় ঝলমল করছে সব। অসম্ভব। এটা আমাদের নয়। দ্রুত পাশ কাটিয়ে অন্য বাড়ির খোঁজ করতে থাকি আমরা।

হাঁটতে হাঁটতে ফুরিয়ে যায় ঝিলের বিস্তার, তার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ, তারও পরে ঘুরি খানিকক্ষণ। কিন্তু কই, আর তো কোথাও বিবাহচিহ্ন চোখে পড়ে না বড়। তবে কি ওই ফেলে আসা বাড়িটাই? ওই বিরাট জাঁকজমকই? হবেও-বা। ফিরে আসি আবার।

দেউড়ি পেরিয়ে সুবেশ এক সজ্জন ভিতরে চলেছেন দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করি, 'আচ্ছা, এ বাড়িটাতেই কি--'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এ বাড়িই। চলে আসুন ভিতরে।' ডানধারে প্রাঙ্গণের বিশাল এক মণ্ডপের দিকে আমাদের চালিত করে নিজে তিনি বাঁয়ের সরগরম বাড়িটায় ঢুকে যান। যাবার আগে অবশ্য ভরসা দিয়ে যান যে বরকে তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন আমাদের নাম।

আশ্বস্ত আমরা সেই মণ্ডপের চাঁদোয়ার নীচে গিয়ে বসি। দালানটা এবার আমাদের ডাইনে। মণ্ডপের ভিতর চারদিকে সারিসারি চেয়ার সাজানো, ঠিক মধ্যখানে গোলাকার এক নিচু মঞ্চ। সেখানে আপনমনে তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে সানাই বাজিয়ে চলেছেন বিসমিল্লা খান। যন্ত্রযোগে নিশ্চয় তা ধ্বনিত হচ্ছে অভিপ্রেত দিকে দিকে, কিন্তু সেই প্রকাণ্ড মণ্ডপে শুধু আমরা দুজনই তার প্রত্যক্ষ এবং কুণ্ঠিত শ্রোতা। নিরুপায়ভাবে অলোক মন দেয় সুরের সমঝদারিতে, আমি কেবলই ডাইনে তাকাতে থাকি দালানবাড়ি থেকে বরের সহাস্য সাদর আবির্ভাব প্রত্যাশায়, কিন্তু বরের বদলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে সরবতের ট্রে হাতে উর্দিপরা বেয়ারা। আমাদের ডাইনে এসে দাঁড়ায় সে।

প্রথমেই বসে আছি আমি, আমার বাঁয়ে অলোক, আর তারপর অগাধ ফাঁকা। আমার সামনে দিয়ে এগিয়ে আসে বেয়ারার গেলাসভরা হাত। আমার বাঁদিক দিয়ে অলোক বাড়িয়ে দেয় তার ডান হাত আমারই বুকের সামনে দিয়ে, গ্লাসটা তাকে দেওয়া হচ্ছে ভেবে। আমাকে দেওয়া হচ্ছে ভেবে আচম্বিতে আমি বলে ফেলেছি 'না'। শুনে মুহূর্তমধ্যে অলোক গুটিয়ে নেয় তার হাত। হতচকিত বেয়ারাটি অল্প একটু দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে যায় দালানে।

অলোককে জিজ্ঞেস করি, 'কী হল? নিলে না কেন?'

'আপনি যে নিলেন না?'

'সে তো আমার ইচ্ছে করছে না বলে।'

'ও! আমি ভাবলুম বুঝি এটাই নিয়ম, নিতে নেই।'

আবার সুরের দিকে ফিরতে থাকি দুজনে। কিন্তু অবস্থানের বেসুরটাকে সরাতে পারে না। বিসমিল্লার সুরও। কিছুটা ইতস্তত করে বলেই ফেলি অলোককে, 'কতক্ষণ আর বসে থাকবে এভাবে? কারোই তো দেখা মিলছে না কোথাও।'

'তাহলে কি পালাবেন?'

'চলো যাই।'

উঠে পড়ি আমরা। বেরিয়ে যাবার চেষ্টায় গেটের দিকে এগোতেই পিছন থেকে বলে ওঠেন একজন, 'কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?'

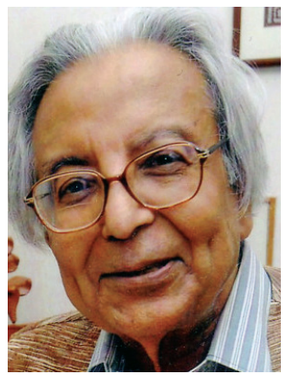

চকিতে ঘুরে গিয়ে বলি, 'না যাচ্ছি না, এই একটু...'।'ও ঘুরছেন? বসুন একটু। উপরে খবর দিয়েছি।'

বসতে হল আবার। সুরশ্রুতি আবার। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে, কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না বুঝে নিয়ে, আবার আমরা ফটকের দিকে এগোই।

সান্ত্রি যদি ধরে এবার? অলোক পরামর্শ দেয়, 'শুনুন, আমরা ঠিক বেরিয়ে যাবার মতো করে বেরুব না। যেন পায়চারি করছি, এইভাবে যেতে হবে।'

ঠিক। অলস পদচারণার ভঙ্গিতে এগোতে এগোতে সান্ত্রির কাছাকাছি পৌঁছতেই তারা হুংকার দেয়, 'কিধার যাতা?' অলোক বলে, 'এই যে, এখানে দাঁড়িয়ে আমরা একটু আকাশ দেখছি।' গেটের বাইরে কয়েক গজ দূরেই ঝিল, তার সামনে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বলোকে নক্ষত্রমালা পর্যবেক্ষণের যে যথেষ্টই যুক্তি আছে, সেটা বুঝতে পেরে 'ঠিক হ্যায়' বলে অনুমোদন জানায় তারা। ঝিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াই, আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে চোরাচাহনিতে পিছন দিকটা একবার লক্ষ করে অলোক বলে, 'ওরা কিন্তু একটু অন্যমনস্ক হয়েছে।'

'হয়েছে? তাহলে এবার দৌড় লাগাও।'

ঝিলের পাড় ধরে দৌড়তে শুরু করি দুজন বাসস্টপের দিকে, হাতে স্যান্ডেল, ইউনিভার্সিটির ঠিক সামনে এসে ধাবমান একটা উত্তরমুখী বাস থামিয়ে উঠে পড়ি তাতে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কন্ডাক্টর এলে বলি, 'গড়িয়াহাটার মোড়'।

গড়িয়াহাটে নেমে এবার তাহলে নিয়মমতো হাঁটতে পারি আমরা। পশ্চিমমুখে কয়েক পা হাঁটার পর জিজ্ঞেস করে অলোক, 'বুদ্ধদেবের ওখানে যাবেন'?

'দুশো দুই? কিন্তু আমার সঙ্গে তো তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই।'

'তাতে কী হয়েছে? চলুন, ভালো একটা সময় কাটবে।'

ঠিকই, অলোককে খুবই উনি স্নেহ করেন, দেখলেই খুশি হবেন। সেই খুশির গল্পগুজবে আমি থাকব শ্রোতা। মন্দ কী! বললাম, 'চলো'।

পৌঁছলাম আমরা দুশো দুইয়ের দোতলায়। দেখেই হই হই করে উঠলেন বুদ্ধদেব, 'আরে এসো এসো অলোকরঞ্জন, খুব ভালো হল। কেউই নেই বাড়িতে, একলাই লাগছিল। এসো। কোত্থেকে এলে এ সময়ে?'

'একটা বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলাম। ফিরবার পথে মনে হল--'

'ভালো করেছ, ভালো করেছ। বিয়েবাড়ির পক্ষে একটু তাড়াতাড়িই আসতে পেরেছ। কার বিয়ে?'

বরকনের পরিচয় জানায় অলোক। তারপর শুরু হয় সাহিত্য সংবাদের কলেজ সংবাদের দেওয়া নেওয়া। মাঝখানে বুদ্ধদেব একবার পরিচারককে হাঁক দিয়ে বলেন, 'ওরে ভালো করে তিনকাপ চা কর। আর হ্যাঁ, একটু কিছু খাবে তো? সঙ্গে ওমলেট ভেজে দিস--'

বাক্যটা 'ওমলেট' শব্দ পর্যন্ত পৌঁছতে না পৌঁছতেই অলোক একেবারে হাঁ-হাঁ করে বলে ওঠে, 'না না, আমরা তো বিয়েবাড়ি থেকে...'

বুদ্ধদেব বললেন, একটু লজ্জিত ভাবেই, 'ও হ্যাঁ, তাই তো। তোমরা তো বিয়েবাড়ি থেকে আসছ বললে। ওরে না, ওমলেটের দরকার নেই, চা-ই কর শুধু।' নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর আবার মন দেন গল্পে। রাত হয়ে যাচ্ছে। উঠতে হয় এবার। 'খুব ভালো লাগল' বলে বিদায় দেন বুদ্ধদেব। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই অলোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি আমি, 'এটা কীরকম হল? সাধা ওমলেটটা এভাবে ফিরিয়ে দিলে তুমি?'

সঙ্গে সঙ্গে বলে অলোক, 'আপনি যে তখন সরবতটা খেতে দিলেন না?'

'বাঃ! কিন্তু এবার তো খিদে পেয়েছে। এবার কী করা?'

'চলুন, একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকি।'

কিন্তু কী আশ্চর্য, ফুটপাথ ধরে এগোতে এগোতে দেখি কোনও দোকানই আর খোলা নেই। আঃ, কী হাল হল কলকাতার! না না, ওই যে ওই-যে। উলটোদিকের ফুটপাথে একটা দোকানের ওই যে শাটার নামাচ্ছে। দৌড়ে গিয়ে মাথা নিচু করে সেখানে ঢুকতে গেলে দোকানি চেঁচিয়ে ওঠে, 'আরে আরে, করেন কী? বন্ধ হয়ে গেছে দোকান।' হোক, ততক্ষণে আমরা ঢুকে পড়েছি ভিতরে। বলছি, 'কিছু একটা নিয়েই বেরিয়ে যাব।'

'কিন্তু কিছুই তো নেই এখন।'

'সে কী কথা? কিছুই নেই? তা কি হতে পারে? দেখুন না একটু খুঁজে...'

সদয় দোকানি তখন বহু সন্ধানে ছোট একখানা চিমড়োনো ফিশ ফ্রাই আবিষ্কার করে, সেটা নিয়ে আমরা বেরিয়ে আসি পথে, পিছনে সশব্দে শাটার পড়ে যায়, ফ্রাইখানা ভাগ করে খেতে খেতে এগিয়ে যাই চৌমাথার দিকে আবার, দক্ষিণগামী উত্তরগামী দুই বাসে দুজনে চলে যাই দুদিকে।

পরদিন অলোক জিজ্ঞেস করে, 'বাড়ি ফিরবার পর বউদি কী বললেন কাল?'

'জিজ্ঞেস করল কিছু খাব কি না!'

'কী বললেন আপনি?'

'বললাম, পাগল না কি! বিয়েবাড়ি থেকে ফিরে আবার খাওয়া! আর তুমি? মাসিমা কিছু বলেননি তোমায়?'

'একই কথা জিজ্ঞেস করেছে মা। আর কী কাণ্ড দেখুন, ঠিক একই উত্তর দিয়েছি আমিও। কিন্তু ঠিক করেছি যে আর কখনও বরযাত্রী যাব না।'

ঋণ ঃ কবিসম্মেলন, শ্যামলকান্তি দাশ

স্বল্প গল্প

ভালোবাসার রং সবুজ

গীর্বাণী চক্রবর্তী

হঠাৎ দমকা চৈতী বাতাস এসে কেয়ার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে যায়। কী আশ্চর্য নীরবতা চারিদিকে। পুবের আকাশ লালচে হয়ে এসেছে। ভোরের এই সময়টা ভীষণ প্রিয় কেয়ার। ময়ূরতলি জঙ্গলের রেঞ্জার অরুণাভর স্ত্রী কেয়া। মাত্র ছয় মাস হল বিয়ে হয়েছে। বীরভূমের রামপুরহাট থেকে সোজা ময়ূরতলি জঙ্গলের অধিবাসী কেয়া। অরুণাভর বাড়িও রামপুরহাটেই। প্রেমের নয়, কেয়ার ছোটমাসির তৎপরতায় সম্বন্ধ করেই বিয়ে।

কাঠের বাংলোর দোতলার বারান্দায় রেলিঙে আলতো করে হেলান দিয়ে কেয়া দাঁড়িয়ে থাকে। সামনের একটুকরো ফাঁকা জমিতে অজস্র বন পায়রা ভীড় জমিয়েছে। ওদের একসঙ্গে উড়ে যাওয়াটা এক অসম্ভব সুন্দর দৃশ্য তৈরি করে। একটু দূরেই তিতি ঝোরা রমণীর সিঁথির মতো এঁকেবেঁকে জঙ্গলের ভিতর হারিয়ে গেছে।

অরুণাভ ঘুমোচ্ছে। কাজপাগল মানুষ। এখনও পর্যন্ত মধুচন্দ্রিমায় যাওয়া হয়ে ওঠেনি ওদের। কেয়া কোথাও ঘুরতে যেতে বললেই ওর গালে আলতো টোকা দিয়ে হাসতে হাসতে অরুণাভ বলে, ম্যাডাম এখানেই তো আমাদের বিনে পয়সার মধুচন্দ্রিমা হচ্ছে। কত লোক বলো তো গুচ্ছের টাকা খরচ করে এখানে আসে মধুচন্দ্রিমা করতে। এখনও আনকোরা গন্ধটা গা থেকে যায়নি বলে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে পারে না কেয়া।

বাংলোর গেটের পাশেই বিশাল ঝাঁকড়া স্বর্ণচাঁপা গাছ থেকে চাঁপাফুলের হালকা সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। খুট করে আওয়াজ পেয়ে কেয়ার চমক ভাঙে। আরে, আজ তো বাংলোর গেটের কাছে চলে এসেছে চিতল হরিণটা। গত কয়েকদিন ধরেই তিতি ঝোরার আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল। হরিণটার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছোট্ট বাচ্চা হরিণ। কেয়া রান্নাঘর থেকে কিছু সবজি এনে একতলার বারান্দার ঠিক নীচে একটুকরো জমি পেরিয়ে কাঠের গেটটা খুলে, দিয়ে আসে হরিণদুটোর সামনে। অথচ হরিণদুটো ওকে দেখে এতটুকু ভয় পায় না। ওরা বোধহয় ভালো মানুষের সুগন্ধ পায়। একঘেয়ে জঙ্গলের জীবন কেয়াকে এক অদ্ভুত ছন্দে ছুঁয়ে যায়। বাংলোর চারপাশে হরেকরকম গাছে বসন্তের জাদুতে ফুলের মেলা বসেছে। এগাছ থেকে ওগাছে বাঁদর দম্পতির দোল খাওয়া দেখতে দেখতে ঘরের দিকে পা বাড়ায় কেয়া। অরুণাভ চা ও টিফিন খেয়ে অফিসে বেরিয়ে যাবে। দুপুরের খাওয়াটা কেয়া অবশ্য অফিসেই পাঠিয়ে দেয়। এই সমস্ত সাতঝামেলার শেষে মধ্য দুপুরে অবসরে গা এলিয়ে দেয়। শেষ বিকেল পর্যন্ত টানা বিশ্রাম।

অদ্ভুত এক আলো-আঁধারি ঘরটার মধ্যে খেলা করছে। ঘুম থেকে ধড়ফড় করে উঠে বসে কেয়া। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা। সাধারণত দুপুরবেলা এত গভীর ঘুম ঘুমোয় না কেয়া। বাইরে ঝিঁঝি ডাকা সন্ধ্যায় বিচিত্র সব আওয়াজ কানে ভেসে আসে। প্রথম যখন কেয়া এই জঙ্গলে আসে, তখন ভীষণ ইচ্ছে করত ওর, দুপুরের পর যে মন্দিরটা থেকে ঘণ্টাধ্বনি ছড়িয়ে পড়ত চারদিকে সেখানে যেতে।

একদিন অরুণাভকে বলেই ফেলে, জঙ্গলের ভিতর যে মন্দিরটা আছে আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে?

মন্দিরের কথা শুনে অরুণাভ আকাশ থেকে পড়ে। চোখ কপালে তুলে বলে, মন্দির! এই গহীন জঙ্গলে কেয়া সুন্দরী মন্দির কোথায় খুঁজে পেল?

আহা, নিয়ে যাবে না ঠিক আছে। কিন্তু মন্দিরটা কোথায় সেটা বলতে তো ক্ষতি নেই। আমি না হয় ফুলমতিয়াকে নিয়ে যাব। রোজদিন দুপুরের পর কি সুন্দর একরকম সুর, ছন্দ, লয়ে ঘণ্টা বেজে চলে। শুনে মন ভরে যায়।

অরুণাভর তুমুল হাসির দাপট আছড়ে পড়ে সারা ঘরে। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে বলে, আমার সুন্দরী বউটা যে এতখানি বোকা, জানতাম না তো! ওটা ঘণ্টাধ্বনি নয়, বন ঝিঁঝির পাখার আওয়াজ।

মায়াবী সন্ধ্যায় একলা ঘরে কয়েকমাস আগের কথাগুলো মনে পড়তেই কেয়ার ঠোঁটে হাসির ঝিলিক খেলে যায়। ঘড়িতে তখন সাড়ে ছ-টা। একটু যেন অস্বস্তি হয় কেয়ার। বিকেল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই তো অরুণাভ চলে আসে। আজ এত দেরি করছে কেন! ঠিক সেই সময় বাগানের মালি রামদীন আর দিনভর কাজের লোক ফুলমতিয়ার আর্ত চিৎকারে চমকে ওঠে কেয়া। তড়িঘড়ি ঘরের আলোটা জ্বেলে বাইরের বারান্দায় আসতেই স্তব্ধ হয়ে যায়। তিতি ঝোরার ওপারে তখন বিশাল হোমাগ্নির শিখা লকলক করে কালচে হয়ে আসা আকাশকে চুম্বন করে চলেছে ক্রমাগত। হাড়হিম করা বুকের ভেতর মুচড়ে ওঠা করুণ বিলাপের সুর ভেসে আসছে ময়ূরতলির গভীর জঙ্গল থেকে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকে কেয়া। পল অনুপল, ক্ষণ অনুক্ষণ সব যেন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে ওর।

বিট অফিসারের স্ত্রী রণিতা যে কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে কেয়া টেরই পায়নি। কেয়ার কাঁধে আলতো ছুঁয়ে রণিতা ফিসফিস করে বলে, শক্ত হও কেয়া। জঙ্গলে দাবানল লেগেছে। একটা হাতির বাচ্চাকে উদ্ধার করতে গিয়ে রেঞ্জার স্যারের জিপ গভীর জঙ্গলে আগুনের মধ্যে আটকে গেছে। এইমাত্র খবর পেলাম। ঈশ্বর আছেন। ভয় পেও না।

ইষৎ কেঁপে ওঠে কেয়া। তারপর ঘোরলাগা গলায় বলে, দাবানল! আমাকে তো যেতেই হবে রণিতাদি। জঙ্গলে ওকে একা ছেড়ে দেব কী করে?

আলুথালু কেয়া কাঠের সিঁড়ি ভেঙে বাংলোর নীচে নেমে আসে। রামদীন, ফুলমতিয়া আশেপাশের অনেক লোক তখন বাংলো চত্বরে। কেয়া শোনো, এরকম করে না... আমরা এখন জঙ্গলে যেতে পারব না। কেয়া, লক্ষ্মীটি কথা শোনো... রণিতার আকুতি ভরা কণ্ঠস্বর হাওয়ায় মিশে যেতে থাকে।

জঙ্গলের ভিতরে বিকট আওয়াজে কোনও গাছ মনে হয় ভেঙে পড়ে। তিতি ঝোরার দু-ধার এতক্ষণ দাবানলের রোষে আলোকিত হয়েছিল। হঠাৎই অগ্নিদেবের রাগ যেন প্রশমিত হয়। এখন শুধু মাঝেমাঝে ধিকিধিকি আগুন দেখা যাচ্ছে আর কালো ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন। এলোমেলো পায়ে কেয়া এগিয়ে যায় সামনের দিকে। হঠাৎ জোরালো আলোয় কেয়ার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। হতভম্ব কেয়া দেখে সামনে অরুণাভর জিপটা এসে দাঁড়িয়েছে। জিপ থেকে নেমে ইষৎ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অরুণাভ কেয়ার সামনে এসে বেশ অনেকটা করে পুড়ে যাওয়া দু'হাত দিয়ে কেয়ার দুটো হাত জড়িয়ে ধরে হই হই করে বলে ওঠে, আমি পেরেছি কেয়া, আমি পেরেছি হাতির বাচ্চাটাকে ওর মা'র কাছে ফিরিয়ে দিতে।

শুধু কি একটাকে! আরও অনেক পশুপাখিকে বাঁচিয়েছেন স্যার। আজকে স্যারের জন্যই তো জঙ্গলের আগুনও কন্ট্রোল করা গেছে তাড়াতাড়ি... জিপের ড্রাইভার রবীন কোড়া অরুণাভর পেছন থেকে বলে ওঠে।

জিপের হেডলাইটের জোরালো আলোয় অরুণাভর মুখমণ্ডল তখন আলোকিত। ঝাপসা চোখে কেয়ার মনে হয়, ওর সামনে অরুণাভ নয় যেন কোনও বনদেবতা দাঁড়িয়ে। ঠিক তখনই কেয়ার পায়ে কে যেন সুড়সুড়ি দেয়। সকালের সেই হরিণের বাচ্চাটা! তিড়িং করে লাফ দিয়ে দূরে দাঁড়ানো ওর মা'র কাছে চলে যায়। আজ সকালেই কেয়া নিজের মধ্যে নতুন প্রাণের স্পন্দনে যে মাতৃত্বের শিহরণ অনুভব করেছিল, সেই মিষ্টি অনুভূতি কেয়ার বুকে দোল খেয়ে যায়। কালো দাবানলের ধোঁয়া সরিয়ে আকাশে টলটলে পূর্ণিমার চাঁদ। সেই জ্যোৎস্নালোকিত রাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে কেয়ার কানে যেন ভেসে আসে তার আধো আধো স্বরের খিলখিলে হাসি। তুলিকলা অভি

জঙ্গলে দাবানল লেগেছে। একটা হাতির বাচ্চাকে উদ্ধার করতে গিয়ে রেঞ্জার স্যারের জিপ গভীর জঙ্গলে আগুনের মধ্যে আটকে গেছে। এইমাত্র খবর পেলাম।